পরবর্তী নাটক "ডাকঘর" লেখা হয়ে গিয়েছিল "অচলায়তন" রচনার মাস দুয়েকের মধ্যেই। ১৩১৮ সালের ৩১ ভাদ্র শান্তিনিকেতন থেকে মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে কবি লিখেছিলেন, "আমি ছোট্ট একটি নাটক লিখেছি। তার গন্ধটুকু কারো নাকে পৌঁছাবে কি না জানি না—কিন্তু আমার নিজের ভালো লেগেছে—সে পুরস্কারটা পাওয়া গেছে। নাটকটার নাম "ডাকঘর"।[২৫] এ নাটক একান্তভাবে কবির অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি-উদ্বেজিত মনোমন্থনের ফসল। স্পষ্টত-ই বলেছিলেন, "ডাকঘর যখন লিখি তখন হঠাৎ আমার অন্তরের মধ্যে আবেগের তরঙ্গ জেগে উঠেছিল। তোমাদের ঋতু উৎসবের জন্য লিখিনি।"[২৬] আসলে "শারদোৎসব"-এর পরবর্তী "রাজা", এবং "অচলায়তন" নাটকেও, ঋতু-চেতনার প্রভাব রয়েছে—"রাজা"তে বসন্ত, এবং "অচলায়তন"-এ বর্ষাঋতুর অনুরণন সহজেই অনুভূত হয়ে থাকে ; যদিও এ-দুটি নাটকেরও কোনোটিই অব্যবহিতভাবে শান্তিনিকেতনের আশ্রম-বিদ্যালয়ের অভিনয়-প্রয়োজনে লিখিত হয় নি।

"ডাকঘর"

অন্যপক্ষে "ডাকঘর"-এ কোনো সুনির্দিষ্ট ঋতু-চরিত্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ চিত্রও অনুপস্থিত; এবং নাটকটির রচনাশেষে আশ্রমে বা অন্যত্র তার তাৎক্ষণিক অভিনয়ের খবরও কিছু জানা যায় না। তাহলেও, সৃজনকালীন কবি-মনোভাবনায় শান্তিনিকেতনের ভাব-পরিমণ্ডল একান্তভাবেই অনুসৃত হয়েছিল ; প্রকৃতির প্রাণস্পন্দিত প্রচ্ছদপটে চেনা মানুষের আনাগোনাও কেমন রহস্যমদির হয়ে ওঠে—অদৃশ্য রাজা আর দৃষ্টিনন্দন ঠাকুরদার ভাবসত্ত্ব চরিত্রের তো কথাই নেই। সর্বোপরি দৈহিক রুগ্নতাবশে অতিশাণিত অমলের 'ফ্যান্সিফুল' শিশু-কল্পনা সমস্ত গল্পের গায়ে রূপকথার এক সহজ-স্বাভাবিক মোহাবরণ ছড়িয়েই রাখে আগাগোড়া। সেই সঙ্গে ছেলের দল, সুধা, এরা সবাই মিলে সেদিনের শান্তিনিকেতন আশ্রমবিদ্যালয়ের কবিমনোগত 'আইডিয়া'র সারাৎসার আজকের পাঠক কিংবা দর্শকের মনেও অজান্তেই ছড়িয়ে দিয়ে যায়।

তাহলেও "ডাকঘর"-এর শিল্প-প্রাণ এবং তার রসরূপ সম্পর্কে কবির অনুভবই চূড়ান্ত!—"প্রবল একটা আবেগ এসেছিল ভিতরে। চল চল বাইরে, যাবার আগে তোমাকে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে হবে।...রাত দুটো-তিনটের সময় অন্ধকার ছাদে এসে মনটা পাখা বিস্তার করল। যাই যাই এমন একটা বেদনা মনে জেগে উঠল। আমার মনে হচ্ছিল একটা কিছু ঘটবে, হয়ত মৃত্যু। স্টেশনে যেন তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠতে হবে সেই রকমের একটা আনন্দ আমার মনে জাগছিল। কোথাও যাবার ডাক ও মৃত্যুর

"ডাকঘর"-এর রসরূপ

২৫। দ্র. শারদীয়া "দেশ" ১৩৭৩।

২৬। রবীন্দ্রনাথকৃত বক্তৃতা—কালীমোহন ঘোষের দিনলিপিতে ধৃত। দ্র. শান্তিদেব ঘোষ—"রবীন্দ্রসংগীত" (উদ্ধৃতি)।

কথা উভয় মিলে, খুব একটা আবেগে সেই চঞ্চলতাকে ভাষাতে "ডাকঘর"-এ কলম চালিয়ে প্রকাশ করলুম।...মনের মধ্যে যা অব্যক্ত অথচ চঞ্চল তাকে কোনো রূপ দিতে পারলে শান্তি আসে। ভিতরের প্রেরণায় লিখলুম। এর মধ্যে গল্প নেই। এ গদ্য-লিরিক। আলংকারিকদের মতানুযায়ী নাটক নয়, আখ্যায়িকা। এটা বস্তুত কি? এটা সেই সময়ে আমার মনের ভিতর যে অকারণ চাঞ্চল্য দূরের দিকে হাত বাড়াচ্ছিল, দূরের যাত্রায় যিনি দূর থেকে ডাকছিলেন, তাঁকে দৌড়ে গিয়ে ধরবার একটা আকাঙক্ষা।"[২৭]

শেষ কথাটি লক্ষ করবার মতো,—কবি-চিত্তে অকারণ-উৎসারিত ঐ 'চাঞ্চল্য'ই "ডাকঘর" নাটকের অতলান্ত রহস্য-মদিরতারও উৎস। অথচ, কার্য-কারণসচেতন সমালোচনা-বুদ্ধি সৃষ্টি-রহস্যের মূলীভূত অকারণ-চাঞ্চল্যতারও কারণ খুঁজতে চায়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অমলের সুদূর-পিপাসাকে একদা কবির ব্যক্তিজীবনে সমসাময়িক বিশ্বভ্রমণ-বাসনার অবদমন জনিত বেদনার প্রচ্ছন্ন উৎসার বলে অনুমান করেছিলেন।[২৮] আজ জানা গেছে "ডাকঘর" রচিত হয়ে গিয়েছিল সেই ভ্রমণ-ভাবনা কবি-মনে উদিত হবার আগেই।[২৯] অন্যপক্ষে প্রমথনাথ বিশী এই উপলক্ষেই ১৯১১ সালে লেখা নাটকের মূলগত ভাবপ্রেরণার প্রসঙ্গে ১৯১৫ সালে লেখা পত্রে ধৃত হোমিও ঔষধের প্রতিক্রিয়ার কথা উপস্থিত করেছেন। ১৯১২-র অপরতর প্রাসঙ্গিক একটি পত্রও এই সূত্রে উপস্থাপিত হয়েছে ; এবং নাটক রচনার অব্যবহিত পরবর্তী ১৩১৮-র (১৯১১) আশ্বিনের আরো দুটি পত্রাংশও।[৩০] তাহলেও, এ-কথা অনুভব করতেই হয়, মানসিক অবদমন কিংবা স্নায়বিক শৈথিল্যের উৎস থেকে "ডাকঘর"-এর মতো আধ্যাত্মিক উজ্জীবনময় রচনা উৎসারিত হওয়া সম্ভব নয় ; বরং অবক্ষয়ী সাংকেতিকতাই—সগোষ্ঠী বদলেয়র যার কেন্দ্রে—সেই মনঃপ্রক্রিয়ার ফসল। অন্যপক্ষে, রবীন্দ্র-ভাবনার অন্তর্লীন উৎক্রান্তি-চিন্তা মৃত্যু-বেদনাবোধের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবেই জড়িয়েছিল—অনেকটা পরিমাণে প্রতীকের মতোই। উৎক্রান্তির একটা দিকে যেমন আছে এগিয়ে যাওয়ার প্রণোদনা, আর একদিকে তেমনি রয়েছে ছেড়ে যাওয়ার উদ্বেজনা। ছেড়ে যাওয়া তো ছিঁড়ে যাওয়াও! পরিচিত পুরাতন হতে উন্মূলিত হয়ে যাওয়া! রবীন্দ্র-কবিতার ঋতুসন্ধি-ভাবুকতায় তার পৌনঃপুনিক প্রকাশ এ-পর্যন্ত বার বার লক্ষ করা গেছে। কবিতার ভাবুকতা আর ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতায় মাত্রাগত পার্থক্য নিশ্চয়ই আছে ; কিন্তু তাদের প্রকৃতিগত সাধর্ম্যকেও অস্বীকার করার কারণ নেই। বস্তুত, এ-ধরনের 'অকারণ-চাঞ্চল্য'-পীড়ায় আরো একাধিকবারই কবি বিচলিত হয়েছেন ; আর তার এক স্মরণীয়তর পরিচয় আছে ১৯১৪-র মে মাসে প্রথম যুদ্ধ-সূচনার সমকালীন অকারণ মনোমন্থনের গহনে। রামগড় পাহাড় থেকে সি. এফ. এন্ড্রুজকে চিঠি লিখেছিলেন, "আমি অরণ্য পথে সংগ্রাম করে চলেছি।...আমার পা দুটি রক্তাক্ত, তবু আমি রুদ্ধশ্বাসে চলেছি। পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে ধুলোয় পড়ে কাঁদি, আর তাঁরই নাম স্মরণ করি। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমায় যেতে হবে, সে আমি জানি। যে বেদনা আমার হৃদয় বিদীর্ণ

"ডাকঘর"-এর মানস উৎস

২৭। তদেব।

২৮। দ্র. র. জী.—২য়।

২৯। দ্র. মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা ১৯১১ সেপ্টেম্বর (?)-এর চিঠি শারদীয়া "দেশ" ১৩৭৩, তথাচ ড. গৌরচন্দ্র সাহা—"রবীন্দ্রপত্রাবলী : তথ্যপঞ্জী"।

৩০। দ্র. প্রমথনাথ বিশী—"রবীন্দ্রনাট্যপ্রবাহ"।

করছে, ভগবান জানেন, তা মৃত্যুযন্ত্রণাই। নিজের পুরোনো সত্তাকে ত্যাগ করা খুবই কঠিন। সময় না এলে কেউ বুঝতেই পারে না, কতদূর পর্যন্ত তার শিকড় ছড়িয়ে গেছে, আর কোন্ অভাবিত অজ্ঞাত গভীরে তার সূক্ষ্ম তন্তুগুলি পৌঁছে অমৃতময় জীবনরস আকর্ষণ করে শুষে নিচ্ছে।...যতক্ষণ জীবনের সব ঋণ শোধ না হবে এবং মৃত অতীতের বন্ধন আমরা ছিন্ন করতে না পারব, ততক্ষণ নির্মুক্ত জ্যোতির্লোক বা প্রেমের অমন অমৃতলোকে প্রবেশ নিরুদ্ধ থাকবে।"[৩১]

উদ্ধৃতি হয়ত দীর্ঘ হ'ল, কিন্তু "ডাকঘর" সম্পর্কিত পূর্ব-ধৃত রবীন্দ্র-স্মৃতির সঙ্গে তুলনা করে পড়লে বোঝা যাবে, যেমন এখানে, তেমনি "ডাকঘর"-এ, কবিচেতনা মন্থিত হয়েছিল উৎক্রান্তি-ব্যাকুলতার রহস্য-গাঢ় আলোড়নে। 'কোথাও বেরিয়ে যাবার ডাক আর মৃত্যুর কথা', 'স্টেশনে তাড়াতাড়ি লাফিয়ে উঠতে' হবার 'আনন্দ', আর ঐ ছেড়ে—ছিঁড়ে যেতে চাওয়ার বেদনা, দুয়ে মিলে যে বচনাতীত আবেগের আলোড়ন জেগেছিল—তাকেই কবি 'কলম চালিয়ে' প্রকাশ করলেন নাটকে। এই মনোভাবনার অব্যবহিত কারণ একটা কিছু ছিলই। কিন্তু তার সবটুকুই ইন্দ্রিয়গোচর তথ্যবেদ্য ছিল,—এমন দাবি করা সঠিক নাও হতে পারে।

বরং, এর উৎস নিহিত রয়েছে কবির অন্তর্লোকে নিয়ত প্রবহমান অসীমাকৃতির গহনে। একেবারে প্রথম থেকেই দেখেছি, আপন অন্তর্বদ্ধ ব্যক্তিত্বের খোলস ভেঙে অসীমে লগ্ন-ব্যাপ্ত হবার আকাঙ্ক্ষা নানাভাবে তাঁর মনকে আন্দোলিত করেছে থেকে থেকে। একেবারে "খেয়া"র কাল হতেই বিচিত্র ব্যথা-বেদনা-পীড়ার অন্তর্বদ্ধতা চেতনা-অবচেতনায় ক্রম-আলিপ্ত হয়ে হয়ে এক চূড়ান্ত মুহূর্তে আত্মনির্মোচনের আগ্রহে আধীর হয়েছিল। সেই তুঙ্গোত্তীর্ণ চৈতন্য কম্পনের সারাৎসার বাঁধা পড়েছে অমলের জীবন-মরণোত্তর উন্মোচনের রহস্য-ব্যঞ্জনায়। এই অর্থেই "ডাকঘর" 'গদ্যলিরিক', ব্যক্তি-কবির মন্ময় অনুভব-উপলব্ধির অনির্বচনীয়তাগুণে সুরভিত! আর ঠিক এই কারণেই 'আলংকারিকদের মতানুযায়ী নাটক নয়' "ডাকঘর" ; কারণ নাটক অর্থে তো ঘাত-সংঘাতময় ঘটনা ; 'অ্যাকশন'-এর দৃশ্যারূপই তার মুখ্য উপাদান। সেদিক থেকে সাংকেতিকতার চরিত্রেই বরং "ডাকঘর"-এর প্রধান ঝোঁক—আখ্যায়িকার মতো তার উন্মোচনের শৈলী! অথচ, তাহলেও, যথাযথ অর্থে "ডাকঘর" এক অত্যুৎকৃষ্ট নাটকই—নাটক যদি আসলে হয় রসোত্তীর্ণ অভিনেয় সাহিত্য। আর সাংকেতিকতার উন্মোচন-কৌশলেই তার অভিনেয় গুণের সহজ উৎসার। "ডাকঘর"-এর আস্বাদনে সেই রহস্যই মূলত সন্ধানযোগ্য।

সাংকেতিকতার প্রকরণ সম্পর্কে মালার্মে বুঝিয়েছিলেন, "এ-হল সেই রহস্যের পরিণততম ব্যবহার যা-নিয়ে প্রতীকটি গঠিত ; ধীরে ধীরে একটি বস্তুরূপে জাগিয়ে তোলা, যাতে এক [নির্দিষ্ট] মানসিক অবস্থা উন্মোচিত হতে পায়, অথবা বিপরীত ভাবে, একটি বস্তুরূপকে নির্বাচন করে তার জট খুলে খুলে ভেতর থেকে [উদ্দিষ্ট] মানসিক অবস্থাটিকে বার করে আনা।"[৩২]

রবীন্দ্রনাথ এখানে প্রথম প্রকরণটির সার্থকতম প্রয়োগ করতে পেরেছেন। একটি মাতৃপিতৃহীন আবাল্যবদ্ধ রুগ্নশিশুর মুমুক্ষু মনোবেদনার চারপাশে শরৎ-মেঘের মতো পুঞ্জ পুঞ্জ ঘটনা-কণিকার অবিরাম আনাগোনার রহস্য-বলয় গড়ে তুলেছেন একের পর এক, ঘন-গাঢ় করে

৩১। ২১মে, ১৯১৪ তারিখে লেখা চিঠি (অনুবাদ) দ্র. মলিনা রায়—"রবীন্দ্রনাথ এন্ড্রুজ পত্রাবলী"।

৩২। দ্র. **W. K. Wimsatt & others—"Literary Criticism—A Short History"** [উদ্ধৃত ইংরেজি অনুবাদের অনুবাদ]

তিলে তিলে। তাতে বিস্ময়, মুগ্ধতা, কৌতূহল, ক্রমশ উৎকণ্ঠার সীমানায় পৌঁছেছে, নাটকের যেখানে উৎক্রান্তি।

কবির নির্দিষ্ট 'মানসিক অবস্থা'র প্রসঙ্গ সূত্রে যদি দেখি, রুগ্ন-বদ্ধ অমলের সুদুর-পিপাসা আসলে কবির তৎকালীন মানস রহস্যেরই বাস্তবায়িত প্রতীক রূপ। আর ঐ বাস্তবায়নেই নাটকের প্রাথমিক দাবি। অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির ব্যঞ্জনা ইন্দ্রিয়-চেতনার সীমান্তলোকে পৌঁছে দিয়েই সাংকেতিকতার দায়িত্ব সারা, আর নাটকের যা কিছু করণ-কৌশল সবই ইন্দ্রিয়গোচরতার প্রত্যক্ষ পটভূমিতে। সাংকেতিকতা স্বভাবাতীতকে স্বাভাবিক প্রতীতির অধিকারে ধরে দেয়, কিন্তু নাটকের 'থীম'কে আগাগোড়াই হতে হয় যথাযথ, স্বাভাবিক! "ডাকঘর"-এর চূড়ান্ত নাট্যকৌশল রবীন্দ্রনাথের মনোমন্থিত রাহস্যিক অনুভবের সার্থকম রূপমূর্তি অমল চরিত্রের আদ্যন্ত স্বাভাবিক—বাস্তবিক নাটকীয় উন্মোচনে।

"ডাকঘর"-এর নাট্য-চরিত্র

তাহলেও, কথা-বস্তুর বিন্যাস কিন্তু আখ্যায়িকার মতোই ; অনেকটা "লিপিকা"র গল্প-গুণান্বিত রচনাগুলির অনুরূপ[৩৩] ; কিছু কথায়—কিছু সুরে—কিছু বা স্বপ্নে গাঁথা! তফাত কেবল—"ডাকঘর"-এর উন্মোচন আগাগোড়া সংলাপের মাধ্যমে। আসল তফাত অবশ্য আরো গভীরে—ঐ সুর, ঐ স্বপ্নকে একান্ত মনস্তত্ত্ব-সম্মত স্বাভাবিক করে তোলার দক্ষতায়। আর তা সম্ভব হয়েছে শিশুমনোধর্মের সঙ্গে আপন রহস্যকর অনুভব-কল্পনার একাত্মতা সম্পাদনে। অবনীন্দ্রনাথের কথা মনে আসে ; সৃজনী কল্পনাকে নিপুণ ভঙ্গিতে তিনি পরমাত্মীয় করে দেখিয়েছিলেন শিশু-কল্পনার।—"ভাবুকের দৃষ্টি কাজ ভোলা ছেলেবেলার দৃষ্টি সৃষ্টির রহস্যের খুব গভীর দিকটায় নিয়ে যায় মানুষকে। ...এমনিতরো ভাবুক দৃষ্টি দিয়ে সব মানুষের শিশুকাল সৃষ্টির যা কিছু—আকাশের তারা থেকে মাটির ঢেলাটাকে পর্যন্ত—একদিন দেখে চলেছিল, কিন্তু অবোলো শিশুকাল আমাদের কেমন দেখলে, কেমন শুনলে, সেটা খুলে বলতে পারলে না। কবিতা ছবি ইত্যাদি লেখার কৌশল, ভাষার খুঁটিনাটি, ছন্দের হিসেব না জানার দরুন শিশুকাল আমাদের কবির ভাষায় আপনাকে প্রকাশ করতে পারলে না।"[৩৪]—অবনীন্দ্রনাথ বলেন, কবি-শিল্পী আসলে সেই অসাধ্য সাধন করেন,—বড় বয়সের পরিণত সৃজনী-প্রতিভার বলে শিশুর মুক্ত কল্পনাকে পূর্ণায়ত রূপ দেন। সাহিত্যে-শিল্পে অবনীন্দ্রনাথ সারাজীবন তাই করে গেছেন—রবীন্দ্রনাথও "ডাকঘর"-এ সেই প্রকরণেরই সফলতম প্রয়োগ করলেন, ঐখানেই নাটকটির অতুলনীয়তা।

শিশু-কল্পনা আসলে অবাস্তব-মনোহর—'ফ্যান্সি' আর 'ফ্যান্টাসি' নিয়ে তার কারবার। আর উদ্ভাবনী কল্পনা—'ক্রিয়েটিভ ইমাজিনেশন'-এর যথার্থ মূল্য আসলে বস্তুকে নিয়েই বস্তূত্তরণের সফলতায়। শিশু-কল্পনা আর উদ্ভাবনী কল্পনার হরিহরতায় "ডাকঘর" হয়েছে রূপকথার সৌরভে-নিবিড় স্বভাব-কথার সারাৎসার।

শিশুমন কল্পনা-প্রগাঢ়—স্বভাবত কল্পনায় মুক্ত। অমলের মধ্যে সেই সহজ কল্পনাধর্ম পীড়ন-মন্থনে উদ্ভাবনী কল্পনার সীমানা স্পর্শ করেছে। বাস্তব জীবনে কোনো একটি ইন্দ্রিয় পীড়িত, কিংবা অকর্মণ্য হলে, অপরাপর ইন্দ্রিয়-চেতনার তীক্ষ্ণতায় তার অভাব পরিপূরিত হয়ে

৩৩। "লিপিকা"র আখ্যায়িকা-চরিত্রের পরিচয়ের জন্য দ্র. 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার" (৫ম সং)।
৩৪। অবনীন্দ্রনাথ—"বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী"।

যায়—অন্ধের শব্দ-স্পর্শ-ঘ্রাণ শক্তির তীক্ষ্ণতর অবধারণ-ক্ষমতার মতো। অমলের বেলাও রোগ এবং বদ্ধতা-পীড়িত বহিরঙ্গের আক্ষেপ অন্তরঙ্গে অনুভবের সীমানাকে অবাধ প্রসারিত করে দিয়েছে মুক্ত কল্পনার ক্ষেত্রে সেই সীমান্তে, শিশুকল্পনা যেখানে উদ্ভাবনী কল্পনায় গিয়ে মিশেছে। এক জায়গায় বসে থেকে থেকে দৃষ্টি তার তীক্ষ্ণ—পুঙ্খানুপুঙ্খ হয়েছে। সেই সঙ্গে বদ্ধ হয়ে থাকার আক্ষেপ মনের গভীরে সুদূরাভিসার-কামনায় অবিরাম উদ্বেজিত হয়েই থেকেছে। তাই একদিকে চোখে-দেখা জীবনের নিবিড় ছবি, দেখেও যা আমরা সচরাচর দেখতে পাই না, আর তারই সঙ্গে অবদমিত নিভৃত বাসনার নির্যাস—দুই মিলে চেনা জগৎকেও কেমন অচেনা রহস্য-মাধুরিতে ভরে তোলে!

অমল মাধব দত্তকে জিগেস করে, "...আমি কি ঐ উঠোনটিতেও যেতে পারব না?" মাধবের সস্নেহ নিষেধের উত্তরে তার আক্ষেপাতুর অবদমিত মনে নিবিড়—করুণাকাতর জিজ্ঞাসা গুমরে ওঠে :—"ওই যেখানটাতে পিসিমা জাঁতা দিয়ে ডাল ভাঙেন। ওই দেখো না, যেখানে ভাঙা ডালের খুদগুলি দুই হাতে তুলে নিয়ে লেজের উপর ভর দিয়ে বসে কাঠবিড়ালি কুটুস কুটুস করে খাচ্ছে—ওখানে আমি যেতে পারব না?"

আবারও নিষেধাত্মক জবাব পেয়ে তার বঞ্চিতমনস্ক শিশুমন সাড়া দেয়—"আমি যদি কাঠবিড়ালি হতুম, বেশ হত!"

অনেকে মনে করেছেন, অব্যবহিত ঐ উৎক্রান্তি-ব্যাকুলতার সঙ্গে শিশু-কবির ভৃত্যরাজকতন্ত্র-বাসের পীড়াকর ব্যক্তিগত অনুভব-স্মৃতি জড়িয়ে পড়েছে অমলের ব্যক্তিত্বে। এ অনুমান যথার্থ হতেই পারে। শিশুমনের নিবিড় সন্ধানী বস্তুদর্শন-প্রবণতা, আর অবাধ কল্পনার রথে চড়ে সর্বাত্মকতার পথে অভিযাত্রা—ফুলের সঙ্গে ফুল, পাখির সঙ্গে পাখি হয়ে জড়িয়ে মিলে-মিশে যাবার রহস্যানুভব,—এ দুয়েই শিশু-কবির বাস্তবিক অভিজ্ঞতা-অনুভবের প্রতিফলন—ঐ দুয়ে মিলেই অমলের স্বাভাবিকতা! ঐ দুই সহজ প্রবণতার বশেই সে দেখা-নাদেখায়-মেশানো জীবনকে স্বভাবসিদ্ধ করে তোলে,—তারই অনুবর্তনে চেনা ভাবনার সঙ্গে আকুল অনুভাবনা মিশিয়ে দইওয়ালার গ্রামখানির—'যে গ্রাম পাঁচমুড়া পাহাড়ের তলায়, শামলী নদীর ধারে'—তার অপরূপ ছবি মনে ধরিয়ে তোলে, ঠিক হয়েও যা ঠিক ঠিক নয়!

ওইখানেই অবনীন্দ্রনাথ-কথিত 'করণকৌশলে'র পূর্ণ প্রকাশ—শিশুর বাসনা-কল্পনা সর্বায়ত স্বপ্ন-কামনা-সম্ভাবনার রোমাঞ্চ সঞ্চারিত করে ফেরে যেখানে। ওই সূত্রেই নাটকে রাজার অনুপ্রবেশও এক অতুল্য প্রতিবেদন রচনা করে। "শারদোৎসব"-এর রাজা দেখেছি যথার্থই রাজা;

"ডাকঘর"-এ রূপকথার বাতাবরণ

"রাজা"র রাজা ঈশ্বরের রূপক ; কিন্তু চূড়ান্ত মুহূর্তে রাজকবিরাজের প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত "ডাকঘর"-এর রাজা তো কেবল অসীম-অরূপ!—অন্তহীন রহস্যের নূপুর-শিঞ্জনে অদেখা রূপের মাধুরি দু'হাতে ছিটিয়ে-বিলিয়ে ঘুরে বেড়ান তিনি অমলের শিশুকল্পনার পাখায় ভর করে। এ-রাজা 'রূপকথা'র রাজা-ই ; শিশুমনের ভয়-বিস্ময়-কৌতূহল উৎকণ্ঠায় তৈরি—অথচ বড় মনেও ঐ 'অপুরুব' রহস্যের[৩৫] দোল-দুলানো অরূপ ছবি সৌরভের মতো ছড়িয়ে থাকে। চূড়ান্ত মুহূর্তে এই অদৃশ্য—দৃশ্যাতীত রহস্যাকর রাজা কেমন কৃপাময় ঈশ্বর হয়ে গেলেন—রাজকবিরাজের

৩৫। ড. সুকুমার সেন মনে করেন—'রূপকথা' আসলে 'অপুরুব কথা'র ব্যঞ্জনাবাহী। দ্র. "বিচিত্র সাহিত্য"।

মাধ্যমে যিনি মুড়িমুড়কির ভোজ চেয়ে পাঠান মধ্যরাত্রের মিলন-সভায়। ঐখানে কেবল 'সাংকেতিকতা'র রহস্যাবরণটুকু তত্ত্বের মোচড় খেয়েছে। তা না হলে দইওয়ালা, প্রহরী, সুধা এবং ঠাকুর্দাতে মিলে গল্পের অরূপ রহস্যের কৌতূহলকে যেমন ইন্দ্রিয়বোধের প্রায় সীমানায় নিয়ে এসেছে অমলের ডাকঘর-কেন্দ্রিক ফ্যান্সি, আর ফ্যান্টাসির বাতাবরণে ধরে ; তেমনি মাধব দত্ত, কবিরাজ মোড়ল-রা মিলে নাটকে স্বভাবানুমত বাস্তবিকতার হাওয়াটুকুও বইয়ে দিয়েছে।

বিন্যাসের প্রকরণে নাট্যরূপ কোথাও নেই—বরং '১' থেকে '৩' সংখ্যা দিয়ে গল্পের মতো বলা যে বিবরণটুকু উন্মোচিত হয়েছে, পুরো একটি আখ্যায়িকাও তাকে বলবার উপায় নেই।

নাটকীয় গঠনকৌশল

কিন্তু সংলাপ-সর্বস্ব ঐ উন্মোচন-রীতির মধ্যেই দৃশ্যগোচর সক্রিয়তার আভাস ব্যঞ্জিত হতে পেরেছে—এমন কি স্থান-কালের ইঙ্গিত সহ। দৃষ্টান্ত হিসেবে '৩' সংখ্যক উপপর্যায়ের শুরুতেই—যদি তাকে দৃশ্যই বলি—তাতে কেবল অমল আর মাধব দত্তের প্রাথমিক কথোপকথন থেকেই বোঝা যায় '২'-দৃশ্যে অমল প্রথম যেদিন পিসেমশায়ের অনুমতি নিয়ে জানালার পাশে বসেছিল—ঐ সমস্ত দৃশ্য জুড়ে ঐ একটি দিনের যত ঘটনাপ্রবাহের প্রকাশ ঘটেছে, তারপরে বেশ কিছুদিন—অন্তত বেশ কয়েকদিন তো কেটে গেছেই—এবং নাট্যদৃশ্য সরে এসেছে পথের পাশের খোলা জানালা থেকে ঘরের ভেতরের রোগশয্যায়।

শুধু তাই নয়, একের পর এক বিচিত্র 'ইন্‌সিডেন্ট' বা অনুঘটনার বিন্যাস একেবারে প্রথম থেকেই অতি দ্রুত লয়ে সঞ্চারিত হয়েছে অকুণ্ঠ পলকবিহীন গতিতে। এ-যেন সিনেমাটোগ্রাফের ঘূর্ণিপাকের মতো ছবির-ওপরে-হুমড়ি-খেয়ে-পড়া-ছবির বিন্যাস-ভঙ্গিতে একটা চলচ্ছবির আদল গড়ে তোলে—যার গভীরে যুগপৎ চলমানতা ও সংহতির প্রতীতি অনিবার্য হয়ে ওঠে। নাটকের প্রথাসিদ্ধ সংঘাতের পরিবর্তে বহমান ঘটনাপ্রবাহের গায়ে গায়ে জড়িয়ে-পড়া এক নতুন রকমের 'ইম্প্যাক্ট' তাতে গড়ে ওঠে। সব কিছু মিলে, অভিনয়-অনুষ্ঠানের ধারাসূত্রে প্রাথমিক কৌতূহল ক্রমশ অনিবার্য উৎকণ্ঠার ক্রান্তি-বিন্দুতে পৌঁছে পরিণামী যে-আবেদন রচনা করে, আসলে সে কেবলই আখ্যান-প্রসূত নয়, শেষ পর্যন্ত—অন্তত অভিনয়কালে—নাট্যচরিত্র-বিশিষ্টই। বিশেষ করে অমলের ব্যক্তিত্ব ঘিরে দইওয়ালা-প্রহরী-মোড়লদের সংরচিত অনুঘটনা-স্রোতের সঙ্গে রাজা-ডাকঘর সংক্রান্ত বিস্ময়-উৎকণ্ঠা, আর মাধব দত্ত-কবিরাজদের প্রতিমুখী বাস্তবিক উদ্যম, সব কিছু মিলে ঘটনার এক জটিল আবর্ত ক্রমেই পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে, '৩' দৃশ্যে ঠাকুরর্দা-রাজকবিরাজে মিলে যার পরিণামী গ্রন্থিমোচন অনেকটা নাটকীয় ক্যাথারসিস্-এর আশ্বস্তিকেই ঘনিয়ে তোলে। সুধার প্রথম আবির্ভাবের বাস্তবিকতা-ঘন সুধামাধুরি ছাপিয়ে তার সমাপ্তিক উক্তির ব্যঞ্জনা সেই মানস বিশোধনের প্রকরণে এক সীমাহীন ব্যাপ্তির অন্তরাভাস সঞ্চার করে।

সব কিছু মিলে রবীন্দ্রনাথ এইখানেই নাটকীয়তার সংগঠনে, কেবল অবয়ব নয়, ধারণাগত

নাট্যশিল্পবোধের নূতন মাত্রা

এক নূতন মাত্রা যোজনা করলেন—যার বশে আধুনিক বিশ্বনাট্য-আন্দোলনের পুরোভূমিতে তাঁর স্বতন্ত্র স্থানটি নির্দিষ্ট হতে পারল। "মুক্তধারা" "রক্তকরবী"-তে যে প্রকরণের গাঢ়তর সংবেদ ; "বাঁশরি" যার রকমফের। রবীন্দ্র-নাট্যকলার—অন্তত তাঁর সংকেতধর্মী নাটক রচনার শিল্পমূল্য সেই নবসংযোজিত আয়তন ও মাত্রার প্রেক্ষিতে বিচার্য। বিদেশী ভাবক যে-কথা অনায়াসে বুঝেছিলেন, আমাদের রবীন্দ্রনাট্য-চিন্তায় আজও তা স্বচ্ছ হয় নি :—"Rabindranath Tagore may break the rules of our common stage-practice, but he breaks

none that govern the leisurely drama of the open air and the court-yard..."[৩৬]

সেই মুক্তাঙ্গন শিল্পকলার নূতন প্রেক্ষিতে "ডাকঘর" দেশে-বিদেশে সার্থক অভিনেয় শিল্পরূপে প্রতিভাত হতে পেরেছিল। রবীন্দ্রনাথের সাংকেতিক নাট্যকলার ইতিহাসে পরিণতির এক নিশ্চিত স্বাক্ষর "ডাকঘর"—পরবর্তী স্তরে বিচিত্র ধারায় এই কলাকুশলতার নানামুখী বিচিত্র প্রসার।